চতুর্থ অধ্যায়

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের প্রকৃতি

'বিজ্ঞান মানুষের মনের ভিতরে ঢুকতে পারেনি; ফ্রয়েড-ইয়ুংরাও পারেনি। অন্তত পুরোপুরি।'— 'হঠাৎ একদিন' (২০০০) উপন্যাসের সূচনায় দিব্যেন্দু পালিত একথা বলেছেন। সত্যি নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা এবং সেই সম্পর্ককে ঘিরে নারী-পুরুষের মনোজগতের বিচিত্র দিক সবসময় কোনো তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফ্রয়েড, ইয়ুং, মার্ক্স, অ্যাডলার, এরিখ ফ্রম, জাঁক লাকা প্রমুখের চিন্তাধারায় নারী-পুরুষের মনস্তত্ত্ব সবসময় একভাবে ধরা পড়েনি। আরো গভীরে কোথায় যেন ফাঁক থেকেই যায়। এই মনোজগতের চেতনাপ্রবাহের উৎস সন্ধানে সচেষ্ট হয়েছিলেন গুস্তাভ ফ্লবেয়ার, ফিওদর দস্তয়েভস্কি, লিও টলস্টয়, হেনরি জেমস, ভার্জিনিয়া উলফ্, ডি. এইচ. লরেন্স, জেমস জয়েস, ভ্লাদিমির নবোকভ প্রমুখরা। বাংলা সাহিত্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, গোপাল হালদার, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে নরনারীর সম্পর্ক এবং তাদের মনোবিশ্লেষণে নিত্য নতুন ভাবনা নিয়ে আসেন। মধ্যবিত্ত মানসিকতাসম্পন্ন নরনারীর জীবনপ্যাটার্নের বিচিত্র আবেগ ও অনুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। আবেগের সঙ্গে অনুভব ও ইচ্ছার সম্বন্ধসূত্রে মন সক্রিয় হয়। আর সেই সক্রিয় চেতনার অবলম্বন হচ্ছে দেহ। মানুষের মনোদৈহিক তাড়নার অবদমন দীর্ঘতর হলে জন্ম নেয় মানসিক ব্যাধি। মানুষের মনোজগতের বিকলন, বহুমাত্রিক বিচ্ছিন্নতা, বিচিত্র টানাপোড়েন, অস্তিত্বের সংগ্রাম সবকিছুই ভিন্নমাত্রায় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উঠে এসেছে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে। যতোই আধুনিকতার ছাপ ছাড়িয়ে অত্যাধুনিক হয়ে উঠেছে মানুষ ততোই তার ভিতরে জন্ম নিচ্ছে অতৃপ্তি আর অপ্রাপ্তির ক্লেদ। সংবেদনশীল মানুষ প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে প্রতিনিয়ত, হারিয়ে ফেলছে প্রিয়জনের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ সহানুভূতি। ফলে মানুষ হয়ে পড়েছে আত্মমুখী, নিঃসঙ্গ। এই চলমান অস্থির সময়ে নারী-পুরুষ বিভিন্ন বিকারের মধ্যে প্রবেশ করছে। হতাশা কাটিয়ে উঠতে না পেরে কেউ কেউ আত্মবিনাশের পথও খুঁজে নিয়েছে। অর্থাৎ এক ধরনের

আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার নিগূঢ় মনোবিকলন এই সময়ে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে ফুটে ওঠে।

দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম উপন্যাস 'সিন্ধু বারোয়াঁ'য় মনস্তাত্ত্বিক সংকটের বীজ উপ্ত হয়েছে অরুন্ধতীকে ঘিরে। প্রেমিক পুরুষ সৌম্যর সঙ্গে বিয়ে না হওয়ায় সে কিছুটা অভিমানী আর আত্মমুখী হয়ে পড়েছে। যার ফলে বিভাসের সঙ্গে তার দাম্পত্যসম্পর্ক সুখের হয়নি। পাড়ার বখাটে যুবক সুনীলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং তাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়। এই আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে উপন্যাসের শেষে ডাক্তার মিত্র অরুন্ধতীর রোগের রিপোর্টে বলেন—

> "— ট্রাবল্‌টা সেন্ট পার্সেন্ট মেন্টাল।...বলতে পারেন, নিউরোসিস। পরস্পর বিরোধী কোনো আঘাতে বা মন-বিরোধী কোনো একটি ঘটনায় এইরকম হওয়া সম্ভব। মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে তখন নিজেকে নিজেই আঘাত করতে চায়। আঘাতের পদ্ধতিও হয় অত্যন্ত স্থূল।"[১]

একদিকে সৌম্যকে না পাওয়ায় তার ইচ্ছার অবদমন, অন্যদিকে সুনীলকে পছন্দ না করলেও তার সঙ্গে জোর করে মেলামেশা— এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে অরুন্ধতী। সৌম্যকে না পাওয়ায় তার ক্ষোভ, অপূর্ণতা সবই তার নিজের যন্ত্রণাকে বাড়িয়েছে।

অরুন্ধতীকে ঘিরে সৌম্য আর বিভাসের মধ্যে কিছুটা মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়েছে। বিয়ের পরেও সুনীলের সঙ্গে অরুন্ধতীর মেলামেশা মেনে নিতে পারেনি বিভাস। কিন্তু কোনোদিন প্রকাশ্যে বাধাও দিতে পারেনি। এক ধরনের বিষের জ্বালায় পুড়ে পুড়ে একেবারে শেষ হয়ে গেছে সে। তাদের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে তার মনে এক ধরনের অশান্তি আসে—

> "সেই ঘৃণাটাকে অবলম্বন করেই ও ক্রমশ নিজের যন্ত্রণা বাড়িয়ে চলছে! দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমি তা সহ্য করেছি, এখনও করছি। এই জ্বালার জগৎ থেকে পালাতে পারলে আমি বাঁচতাম।"[২]

তীব্র এক অস্বস্তিতে ছটফট করে সৌম্যও। জ্বালা করে চোখদুটো। তার নিজেরই কথায়—

> "চোখ ভরা এই যে জ্বালা, সেটা শুধু একটা আত্মধিক্কার। অরুন্ধতীর কথা মনে পড়লে রাগ হয় না; সুনীলের ওপরেও বিন্দুমাত্র আক্রোশ জাগে না। রাগ হয় শুধু নিজের ওপর। নিজেরই বুকের ভেতর ফুটে ওঠা একটা সুন্দর ভালোবাসাকে অসম্মান করে শুধু অরুন্ধতীই নয়; বিভাসের জীবনটাকেও যে বিষময় করে তুলেছে সে!"[৩]

'সেদিন চৈত্রমাস' উপন্যাসে দুই পুরুষের মাঝে অবস্থানরত একজন নারীর মানসিক সত্তার উন্মোচন ঘটিয়েছেন লেখক। অল্প বয়সে বিয়ে যাওয়া এষা বেশি বয়সের স্বামীকে মেনে নিতে পারেনি। বিবাহিত জীবনে সে সুখ পায়নি। বিয়ের প্রথমরাতে স্বামীর সঙ্গ ভালো লাগেনি তার। সে সুখ অমলেন্দুর কাছে নেয়—

> "সেদিন স্পর্শে শরীর সাড়া দেয়নি, জ্বালায় জ্বলেছে। আজকের অনুভূতি অন্য। অমল আজ জ্বালিয়ে দিল; এবং সেই তীব্র উত্তাপে জ্বলে নিজেকে নিঃশেষ করতে করতে এষার মনে হয়েছিল, সে যেন শরীরের সীমায় পৌঁছে গেছে; পুরুষের স্পর্শে এত স্বস্তি, সে জানত না; যে এতদিনে তার শরীর সার্থক হল।"[৪]

তাই সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী অমলেন্দুর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু অমলেন্দু ভালোবাসলেও আশ্রয় দিতে পারেনি। অপরদিকে তার স্বামী মৃণালকান্তি আশ্রয় দিতে পারে কিন্তু ভালোবাসতে পারে না। এই অবস্থায় এষার কাছে তার নারীধর্ম বড়ো হয়ে উঠেছে। সে কারো কাছেই আবদ্ধ থাকতে চায়নি। তাই একসময় স্বামী ও প্রেমিককে ছেড়ে একার জীবন বেছে নিয়েছে সে।

> "মন বলে একটা বস্তু আছে, ...সে আমার, আমার, আমারই নিজস্ব, তাকে আমি অন্যের মুঠোয় তুলে দিতে পারি না। আমি আমার সর্বস্ব দেব, কিন্তু আমার শূন্যতা যে ভরে দেবে, সে কোথায়?"[৫]

মনোধর্মে মানুষ ইচ্ছা করে, যে ইচ্ছা পূরণ করতে পারলে খুশি হয়, তার সবটা না হলেও কিছু কিছু ফলে যায়। 'ভেবেছিলাম' উপন্যাসে কথকের এরকমই ইচ্ছার কথা বলেছেন লেখক। ছোটোবেলায় কথক সাঁতার কাটতে পারতো না। জলে তার খুব ভয় ছিল।

তার বাল্যবন্ধু সুধাংশু একবার তাকে মাঝ নদীতে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। ডুবে যেতে যেতে কোনোরকমে দম নিয়ে তীরে ফিরে আসে। ভরাডুবির ঘটনার পরও অনেকদিন পর্যন্ত মৃত্যুর আশঙ্কা কথকের মন থেকে দূর হয়নি। নদীর দিকে যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিল। কথকের ধারনা হয়েছিল, নিতান্ত কৌতুকের জন্য সুধাংশু তাকে মাঝ-নদীতে নিয়ে যায়নি। যে কারণেই হোক সুধাংশুর আক্রোশ ছিল তার উপর এবং সুযোগ পেলেই তাকে হত্যা করবে। এইভাবে মৃত্যুর আশঙ্কা ক্রমশ মুহ্যমান করে ফেলেছিল তাকে। রাত্রে দুঃস্বপ্নও দেখে, সুধাংশু বা সুধাংশুর মতো কেউ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতো, আবিষ্ট করতো, টেনে নিয়ে যেত জলের মধ্যে এবং ডোবানোর চেষ্টা করতো। এইসময় অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করতো কথক। এখানে কথক ফোবিয়ায় ভুগেছিল। ফোবিয়া সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন—

> "ফোবিয়া একরকমের নিউরোসিস। এই রোগে দেখা যায়, রোগীরা যখন কোনো বিশেষ অবস্থায় পড়ে, তখনি ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে— যদিও ওই অবস্থা বা বস্তুর মধ্যে বাস্তবিক ভয়াবহতা কিছুই থাকে না। এই সঙ্গে আরও দেখা যায় যে, এই ধরনের রোগীরা সবসময়েই চেষ্টা করে ওই অবস্থায় না পড়ার, অথবা এইসব বস্তুর মুখোমুখি না হওয়ার। যদি ওই অবস্থায় পড়ে যায় তাহলে— কিভাবে সেখান থেকে পালাবে তার পথ খোঁজে।"[৬]

আতঙ্কে, ঘৃণায়, ক্রোধে কথকের অবচেতন মন চেয়েছিল, যে কোনো প্রকারে সুধাংশুর মৃত্যু হোক। দশ-বারো বছর পর টিবি রোগে সুধাংশুর মৃত্যু হয়। তখন হঠাৎ কথকের মনে হয়, সুধাংশুর মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী। এক ধরনের অপরাধবোধের চিন্তায় সে অভিভূত হয়ে পড়ে।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে এমন কতকগুলি চরিত্র আছে যারা অহেতুক সন্দেহ করে। এরা নিজেদের আত্মীয়, বন্ধু অথবা সহকর্মীদের ওপর আস্থা রাখতে পারে না। স্বামী বা স্ত্রী চরিত্রে সন্দেহ করে দাম্পত্য জীবনকে বিষিয়ে তোলে। অতি তুচ্ছ কারণে অপমানিতবোধ করে। কেউ এদের অপমান করলে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে মনে হলে এরা সে কথা ভুলে যেতে পারে না, প্রতিশোধের সুযোগ খোঁজে। এরা কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না, বিশ্বাস করে কাউকে কোনো কথা বলে না। এরা নিরর্থক ঝগড়াঝাঁটি করতে অতিশয়

অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অন্যের দোষ দেখতে নিদারুণ ব্যগ্র হলেও নিজেদের বিরূপ সমালোচনা বরদাস্ত করতে পারে না একেবারেই। নিজেদের প্রাধান্য যেখানে নেই, সেখানে তারা থাকতে চায় না। মনোবিজ্ঞানে একে প্যারানয়েড পারসোনালিটি বা সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিত্বের বিকার বলে। এইরকম ব্যক্তিত্বের বিকার দিব্যেন্দু পালিতের 'প্রণয়চিহ্ন' উপন্যাসের মহীতোষের মধ্যে দেখা যায়। মহীতোষ তার ব্যবসার সুবিধার জন্য স্ত্রীকে মক্কেল ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিজেই ঘনিষ্ঠ হতে বলেছিল। কিন্তু এর মধ্যে যে মানসিক ঔদার্য, তা কোনোকিছুই তার মধ্যে ছিল না। কোনো কারণ ছাড়াই পরবর্তীতে সে স্ত্রীকে সন্দেহ করেছে। এষার কাকার বন্ধু পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গেও জড়িয়ে এষাকে সন্দেহ করেছে মহীতোষ। আসলে সন্দেহ মহীতোষকে অন্ধ করে দিয়েছিল। সন্দেহের বশেই মহীতোষের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে—

> "খুন আমি তোমাকে করব। তোমার যত প্রেমিক আছে সকলের সামনে খুন করব। একটা নষ্ট মেয়েমানুষকে কী করে ট্রিট করতে হয় আমি জানি।"[৭]

তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক আর টিকেনি। মহীতোষ এষাকে ডিভোর্স দেয় এবং সে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল। অপরদিকে এষার মনোবিশ্লেষণ নির্মাণে লেখক কাহিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। দিব্যেন্দু পালিত পুরুষ অপেক্ষা নারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করতেন। নারীর মনকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এষার আর কেউ ছিল না। ডিভোর্স তাকে এক ধরনের মুক্তি দিলেও নিজেকে নিয়ে চিন্তায় ক্লান্তি ছাড়া আর কিছু পায়নি। যতো ভেবেছে ততোই তীব্র হয়ে উঠেছে তার মানসিক অবসাদ। এর একটি কারণ সে একাকীত্বে ভুগে। একসময় আত্মহত্যার কথাও ভাবতে হয় তাকে, কিন্তু এষা বাঁচতে চায়। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায়। তাই এষা বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে মিশেছে। শেখর, মনীশ, পরিতোষ তার প্রেমিক পুরুষ হয়ে ওঠে। তারাই তার সুখদুঃখের সঙ্গী, একাকীত্ব কাটানোর বন্ধু। কিন্তু কামনা-বাসনার অবদমিত ইচ্ছাকে এষা কোনোদিনই ভুলতে পারেনি। তাই খুব সহজেই এষা শেখর কিংবা মনীশের সঙ্গে শরীরী খেলায় মেতে উঠেছে। আর নিজের দেবর পরিতোষকে একসময় সম্পর্কের বন্ধনে ছোটো মনে হলেও এখন তাকেই অবচেতন মনে প্রেমিক পুরুষ ভাবতে থাকে।

> "বুঝি পরিতোষের সহানুভূতি এখন আমার ভেতর পর্যন্ত ছুঁয়ে যাবার চেষ্টা করছে, মেঝে নিকানোর মতো এখন ও আমার সমস্ত গ্লানি শুষে নিতে চায়। এ সেই

পরিতোষ, যাকে আমি কখনও পুরুষ বলে ভাবতে পারলাম না, যুবক বলে ভাবতে পারলাম না; আমার ভেতর থেকে উঠে-আসা বিকল্প সত্তার মতো যে ক্রমাগত ছায়া বিস্তার করে যাচ্ছে আমার ওপর! এই মুহূর্তে ওর সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল আমার। বড়ো অল্প আয়োজন নিয়ে আসো তুমি, পরিতোষ, এত বড়ো অন্ধকার কি মোমবাতির আলো দিয়ে আড়াল করা যায়! বরং নির্দয় হয় তোমার দাদার মতো, বরং তুমি দুর্ব্যবহার করো, যে-কোনো পুরুষের মতো আকাঙ্ক্ষা করো আমাকে, ডুবে যাও আমার চরিত্রহীনতার সমুদ্রে। আমি কিছু ভাববো না। বরং সম্পর্কের এই আকস্মিক পরিবর্তনই আমার স্বাভাবিক মনে হবে। আর কিছু নয়, তোমার প্রতি দুর্বলতাটুকু আমি কাটিয়ে উঠতে চাই— যে-কোনো রকমের সম্পূর্ণতা অর্জনের জন্যে তোমার এই পরিবর্তিত ভূমিকাটুকু আমার দরকার।”[৮]

সে কি বেঁচে আছে ঠিকঠাক? লেখক জানান—

“সম্পর্কের পারস্পরিক উত্তাপে প্রাণবন্ত হয়েও মানুষ কেঁপে উঠছে আকস্মিক বিচ্ছেদের শীতে, নিঃসঙ্গতা ত্রাণ খুঁজছে যৌনতায়, বৈধ-অবৈধের সূক্ষ্ম ভেদাভেদের ওপর দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষায় বিলীন হচ্ছে মানুষ, ধরতে পারছে না ঠিক কোনটা পাপ কোনটা পুণ্য— তখন নিঃশব্দ ও নিরুপায় কান্নায় ফাঁপিয়ে তুলছে রক্ত ও শিরা। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি নিয়তিক্লিষ্ট এই তার ভূমিকা, নির্ভরতাহীন; বুঝতে পারে না জৈবিক ও আধ্যাত্মিকের মধ্যে দূরত্ব কতখানি— স্মৃতি, দুঃখ ও অপমান নিয়ে বহুর মধ্যে মিশে সে শুধু হেঁটে যাচ্ছে একা-একা।”[৯]

‘সন্ধিক্ষণ’ উপন্যাসে চেতন-অচেতন মিলেমিশে ঘটে চলে প্রগাঢ় এক স্ট্রিম অব কনশাসনেস। উপন্যাসের শুরুতে কনকের মৃত্যুকে ঘিরে দাশরথি, অমিয়, শ্যামল, নিখিল, রেখা, বুলা, ঝুমি— প্রত্যেকটি চরিত্রের বিচিত্র ভাবনার স্রোতকে লেখক তুলে ধরেছেন। কনকের মৃত্যুর দিনে অমিয় বলেছে ‘জেগে থাকার ইচ্ছেটাই ঘুমোতে দিচ্ছে না’। ঘুমের মধ্যেও স্বপ্নে জাগরণ থাকে। নিখিল স্বপ্নেই পেরিয়ে যায় অনেকটা পথ। স্বপ্নে বর্ণিল রঙের রূপবদল চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে নিখুঁতভাবে চিনিয়ে দেয়। সিনেমা হলে ঢুকে ঝুমির চোখের পাতা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে আসে। “তখন স্বাভাবিক হলদে রং ক্রমশ নীলাভ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল পর্দায়, চোখের পলকেই আবার লালের আভা। ঠিক লালও হয়তো নয়— যাকে

ক্রিমসন বলে, অনেকটা তাই, রঙের ওঠাপড়া দেখে মনে হয় জলের নিচ দিয়ে তীব্র বাতাস ছুটে চলেছে। ওরই মধ্যে ঘুমন্ত মেয়েটির অস্পষ্ট মুখ ভেসে উঠে হারিয়ে গেল আবার— দুটো তেজী ঘোড়ার পা— ক্রমাগত রঙ বদলের আড়ালে পা দুটি অদৃশ্য হতেই আরেকটি দৃশ্য : অস্ফুট স্তনের ওপর সোনালী অশ্বাক্ষুর ক্রমাগত আঘাত করে চলেছে..."[১০] এখানে জড়িয়ে থাকে যৌনতা ও শরীরী চেতনা।

'সন্ধিক্ষণ' অশান্ত অস্থির নাগরিক ব্যক্তিদের অসহায়তা ও বিপন্নতার ছবি। ইয়ুং যাকে বলেছেন— "the yearing for rest that arises in a period of unrest."[১১] সেইজন্য চরিত্রগুলি অবিরাম পথ হাঁটে। বাস্তবের চড়া আলোয় নয়, অন্ধকারে সেই পথহাঁটা। তার সঙ্গে চলে চেতনাপ্রবাহ। এ হাঁটা শুধু রাস্তায় হাঁটা নয়, মনের সরণী, স্মৃতির সড়কও পেরিয়ে যাওয়া। "রাস্তাটা বড়ো দীর্ঘ মনে হয় অমিয়র। ক্লান্তিতে পা আর চলে না। অথচ মানুষজন চলে, চলে শব্দ, ট্রাফিক সঙ্কেতে মাছের ঝাঁকের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি গাড়ির ঝাঁক, আবার চলতে শুরু করে— ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, মোটর-চলার কোনো বিরাম নেই।"[১২]

অমিয় এক অজানা জগতে নিয়ে যায় পাঠককে। যেখানে এক রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে হয়। অচেনা অলিগলি অরণ্যে পথ পরিক্রমা করার মতো। বাড়ি ফিরে চৌবাচ্চার জলে অনেকক্ষণ স্নান করে অমিয়। স্নায়ুময় অবসাদ আসে। স্ত্রীর নিঃশ্বাসের মতো "অসংখ্য অদৃশ্য পোকা এই সময় অমিয়র বুক বেয়ে হাঁটাচলা শুরু করে দেয়।"[১৩] হঠাৎ মনে হয় 'টাইমপিস্‌টা তার বুকের ওপর কেউ চেপে ধরেছে'। নিখিলের ক্ষেত্রেও বুলার সঙ্গে তার সম্পর্কে মৃদু ঘুম এবং পুরনো অবসাদের প্রসঙ্গ আছে।

'সম্পর্ক' উপন্যাসের রামতনুরও রাতে ঘুম আসে না। রীতিমতো অবসন্নবোধ করে সে। অপরাধবোধ তার সমস্ত মন জুড়ে বসে। বড়ো ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রামতনু কাজপাগল মানুষ। তার কাছে পরিবারের জন্য নৈতিক দায়িত্বটুকুও পালনের অবসর ছিল না। মেয়ের সঙ্গে স্টেশনে যাবার কথা ছিল। কিন্তু কথা দিয়েও যেতে পারেনি। সে ভুলে যায়। এরপর শুরু হয় তার দ্বিতীয় সত্তার আলোড়ন—

"নিজের ওপর এক ধরনের বিরক্তি দেখা দিল, আত্মধিক্কারে ক্ষুব্ধ বোধ করলেন তিনি। যা ঘটল, কোনো কৈফিয়ত দিয়েই তা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। অন্যের কথা বাদ দিলেও নিজের কাছে কোন কৈফিয়ত দেবেন তিনি।"[১৪]

এই সূক্ষ্ম অপরাধবোধ থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি রামতনু। তাই একসময় স্ত্রীর অপমান আর নিজের অবসাদের ভারে আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করতে হয় তাকে। সবকিছু গোলমাল হয়ে যায় তার। তিনি প্রকৃতিস্থ নেই, স্থান-কাল-পাত্র হারিয়ে ফেলেছেন। দেহের অস্বাচ্ছন্দ্যের মতোই ক্লেশকর তার এই মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য। লেখক তার মনের অবস্থা সম্পর্কের বলেন, রাতকানা পাখির মতো চিন্তাটা তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে যাচ্ছে, শবদাহ সেরে শ্মশান থেকে ফেরার পথে যেমন হঠাৎই পূর্বস্মৃতি জেগে ওঠে' তেমনি মানুষটির ধ্বস্ত বিবেক।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্ররা জটিল এবং বিশাল বিশ্বের নানা প্রশ্নের মায়াবী বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। 'আমরা' উপন্যাসের কথক প্রিয়নাথ মজুমদার এরকমই বিষণ্নতায় বা ডিপ্রেশনে ভোগে। কোনোকিছুতে ভালো লাগে না তার। তার মনে আনন্দ-ফুর্তির অভাব। সবসময়েই অকারণ দুঃখের ভার, হীনমন্যতা, হতাশা, নৈরাশ্যবাদিতা, ভগ্নোৎসাহ, আত্মবিশ্বাসের একান্ত অভাব তার মধ্যে দেখা দেয়। কোনোকিছুতেই তার আগ্রহ নেই— প্রিয়জনের সঙ্গে আলাপ-গল্পগুজব করা, সিনেমা, টিভি, রাজনীতি কিছুতেই তার সুখ নেই। কথাবার্তা, চলাফেরায়, সাজপোশাকে, মুখের ভাবভঙ্গীতে তার মনে অসুখী ভাবের প্রকাশ পায়। সর্বত্রই অনুভব করে মননাবিহিন, আবেগবিহীন, বেদনাবিহীন এক অসাড়তা। সে তার অসাড় মন নিয়ে আত্মগত মনোবৃত্তে ঘুরপাক খায়। কোনো সিদ্ধান্ত সে নিতে পারে না। তনুশ্রী নামে একটি মেয়েকে ভালোবাসে। তনুশ্রীও তাকে ভালোবাসে গভীরভাবে। কিন্তু ভালোবাসার মধ্যেও তার মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয় না। তার নিজেরই স্বগতোক্তিতে বোঝা যায়—

"মাঝে মাঝে প্রকৃতই গুলিয়ে যায় সব কিছু, তখন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, ভালোবাসা কী? তখন, তনুশ্রীর গা থেকে বেরনো ঘামে ও পাউডারের সঙ্গে গুলিয়ে ওঠে নিঃশ্বাস; কোনো রকমে নিজেকে সংবরণ স্বরে জিজ্ঞেস করে, প্রিয়নাথ, এর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী? কিংবা অমলাদির সঙ্গে? সুধার সঙ্গে? নয়নাংশুর সঙ্গে? ভয়

হয়, বড়ো ভয় লাগে, এসব প্রশ্ন থেকে পেরিয়ে আসার জন্যে প্রাণপণ হাঁটতে শুরু করি আমি, দ্রুত ও অবিন্যস্তভাবে।"[১৫]

'একা' উপন্যাসে স্বপ্ন-জাগর অবস্থায় শিশিরের অবচেতন মনকে দিব্যেন্দু পালিত অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। শ্রীলা, সুষি, পাকড়াশি প্রভৃতি অনেকেই তার স্মৃতিপথে যাতায়াত করে। অতীত এসে বর্তমানে মিলে যেতে থাকে। লেওন ইডেল তাঁর 'The Modern Psychological Novel' গ্রন্থের দশতম অধ্যায় 'Novel as Poem' প্রবন্ধে এক ধরনের 'পোয়েটিক ইমেজ'-এর কথা বলেছেন। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে তারই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শিশির তার নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে সমস্তকিছু চিনে নিতে চায়। এইভাবে "ক্রমশ সাবলীল হয়ে ওঠে পৃথিবী আর এক পৃথিবীতে— সমস্ত হাওয়া এসে ক্রমশ ছুঁয়ে যায় তাকে, মাংস থেকে ক্রমশ আলাদা হতে থাকে হাড়, ধূপের গন্ধময় আচ্ছনতা এমনকি বেলার রোদ্দুরেও চুপিসারে ডেকে আনে গভীর মধ্যরাত।"[১৬]

স্মৃতি মাঝে মাঝে শিকড় ধরে টান দেয় শিশিরের। শব্দের মধ্যে হারিয়ে যায় শব্দ, একান্তে নিজের হাটা-চলার শব্দ সোচ্চার হয়ে ওঠে কানে। নিজেই সম্মোহিত হয়ে বিড়বিড় করে বলে ওঠে, "শিশির, আছি। অপেক্ষায় আছি। — শুধু বুঝতে পারছি, আমার দিনমান আটকে যাচ্ছে স্মৃতির খেলায়; শুধু দেখতে পাচ্ছি, চেনাশোনা শব্দগুলো থেকে শীতের পাখির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে অর্থ; নতুন তাৎপর্য নিয়ে ফিরতে আসছে তারা।"[১৭] এরকম দিবাস্বপ্ন শিশিরের অবচেতন মনকেও চিনিয়ে দেয়।

আবার 'ইনসমনিয়া'য় ভুগে শিশির। নির্বান্ধব শিশির ক্রমশ একা হতে থাকে। স্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু একটা অস্বস্তি, একটা আড়ালের যন্ত্রণা এসে সবকিছু এলোমেলো করে দেয় তার। তখন স্মৃতি বিজড়িত বিস্মৃতির দিকে ক্রমাগত একা হাঁটতে থাকে সে। "মাথার ভিতর ফেঁপে আঠা হয়ে যাচ্ছে শিরাগুলো। সেখানে ঘুম। কিন্তু দু'হাতে চুলের মধ্যে বিশৃঙ্খল আঙ্গুলগুলো ঠেলতে ঠেলতে শিশির হাই তুলল, কিন্তু সে ঘুমোবে না।"[১৮]

লেওন এডেল তাঁর 'The Modern Psychological Novel' গ্রন্থে যে 'Mental Prattle'-এর কথা বলেছেন, 'উড়োচিঠি' উপন্যাসে চন্দনার 'মাথার ভিতর হঠাৎ দড়ির খেলা' সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। ভাবনা তাকে অনেকদূর টেনে নিয়ে যায়। পাঁচবোনের ছোটো

হয়ে তাকে শুধু অপেক্ষা করেই যেতে হয়। তার 'মাথা ঘোরে; শরীরে অন্ধকারের এই চমকটা ঠিক সহ্য করতে পারে না সে। দ্রুত ঘেমে ওঠে হাতের চেটো। অনেক সময় সামলে নেয়, যখন পারে না তখন তারপর কি হয় বুঝতে পারার আগেই আবার ফিরে যায় অন্ধকারে।...এই বয়সে নাকি অনেক মেয়েরই হয়, বিয়ে হলে ঠিক হয়ে যায়।"[১৯] এই যৌন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি হিস্টিরিয়া রোগের কারণ। আবার টুপুর ভেতরে 'ঢেউ তোলা নদীর মতো কি একটা বয়ে যায়'। "এই মুহূর্তে মনের সমস্ত দ্বিধা নিয়ে পৃথিবীর আলো হাওয়া ছড়িয়ে পড়ছে এক রকম ঐশ্বর্য; বহুদূর ব্যাপ্ত উজ্জ্বলতার মধ্যে টুপুর দেখতে পায় তার বিভিন্ন রঙ খামখেয়ালি অনুভূতি হয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে তার লুকানো শরীর ও শরীরের ভিতর তালাবন্ধ ছোট ছোট ঘরগুলোকে।"[২০] এ তার মগ্নচৈতন্যের 'স্ট্রিম অব কনশাসনেস'-এরই অনিবার্য ইঙ্গিত। তার ইচ্ছে করে চেতন মনের পলকা অবরোধ সম্পূর্ণ অবারিত করে যে যেমনভাবে যা ইচ্ছে করুক তাকে নিয়ে। প্রায় সুখকর এক অজানা অনুভূতির মধ্যে নিজেকে চিনে নিতে থাকে। তার ইচ্ছে করে এই সুখ চিরস্থায়ী হোক। এটা টুপুর মধ্যে ফ্রয়েড কথিত অদস্-এর প্রভাব।

'অবৈধ' উপন্যাসে যৌনতা খুব ঋজু এবং বলিষ্ঠ। 'চরিত্র' উপন্যাসে আহামরি আর নৃসিংহর যৌন কামনায় যে পাপ ধরা পড়ে, 'অবৈধ' উপন্যাসে পার্থ আর জিনার সক্রিয় কামনায় পাপের ছোঁয়াটুকুও নেই। মানসিকতার দিক থেকে দুজনেই সংস্কারমুক্ত দুই নরনারী। গুঢ়ৈষাকে অবদমনে পৌরুষ নেই কোনো। পুরীর হোটেলে অন্ধকার যেন উৎসাহ দিয়েছে পার্থ আর জিনাকে। অন্ধকারে নিজের শরীরের ঘ্রাণ মিশিয়ে দেয় পার্থর শরীরে। 'নিজের নিরাবরণ সর্বাঙ্গে পার্থর শরীরের আদ্যন্ত পৌরুষ জড়িয়ে, আর্ত স্তনদ্বয়ে পার্থর বুকের পেশি ও রোমরাজির কোমল স্পর্শ অনুভব করতে করতে, পার্থর নিঃশ্বাসের প্রতিটি উত্থান-পতন নিজের নিঃশ্বাসে মিশিয়ে নিতে নিতে' ঘুমিয়ে পড়ে জিনা।[২১] দিব্যেন্দু পালিতের এই বর্ণনায় অশ্লীলতার রেশমাত্র নেই। কারণ, এ তো শুধু শরীরী আকর্ষণ নয়। জিনা স্পষ্ট অনুভব করে 'কী যে সন্তর্পণে ঘোরাফেরা করছে তলপেটের অন্ধকার অভ্যন্তরে, এতকালের অনাদরে ম্লান একটির পর একটি কোষ ভরে উঠছে নতুন সম্ভাবনায়'।[২২] আদিরসের খেলা এই উপন্যাসে সৃষ্টির দ্যোতনা বহন করে আনে। এখানেই দিব্যেন্দু পালিত সার্থক শিল্পী।

ফ্রয়েডের অনেক পরে জাক লাকাঁ মানবমনস্তত্ত্বকে শুধু অবদমনে খোঁজার কথা বলেননি। শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনের বিভিন্ন শাখায় মানবমনস্তত্ত্বকে খোঁজার চেষ্টা

করছেন। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে এই বিষয়টি দেখা যায়। 'অনুভব' উপন্যাসের আত্রেয়ীকে কলকাতার ইউনেস্কোর প্রোজেক্টে কাজ করতে আসার মাধ্যমে চিনে নেওয়া যায়। আবার 'মৌনমুখর' উপন্যাসে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের মাধ্যমে তড়িৎকে, 'সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'ঢেউ' উপন্যাসে চরিত্রদের চেনা যায় বিজ্ঞাপন জগতের প্রসঙ্গকে সামনে রেখে। আবার এক ধরনের 'ইমাজেনারি ফরমেশন' থেকে চিনে নেওয়া যায় 'সহযোদ্ধা' উপন্যাসের আদিত্য রায়কেও। জাক লাকাঁ "Beyond the reality principle' গ্রন্থে 'Object of psychology' প্রসঙ্গে বলেছেন, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে চরিত্র ধরা পড়ে "with all his desires, imaginary formations, language and meaning."[২৩]

মনোবিজ্ঞানীদের (বিশেষতঃ ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানীদের) মতে উৎকণ্ঠা মানসিক দ্বন্দ্বের লক্ষণ। কোনো কারণে নির্জ্ঞান মনের অবদমিত অবাঞ্ছিত বাসনাগুলি যখন সজ্ঞান মন বা চেতনায় আসার উপক্রম করে, তখনই মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এবং সে দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ হচ্ছে এই উৎকণ্ঠা।[২৪] এই অবদমিত কামনা বা ইচ্ছাগুলির সাধারণ প্রকৃতি হচ্ছে, হয় তারা ধ্বংসাত্মক-হিংসাত্মক বৃত্তিমূলক অথবা যৌনবৃত্তিমূলক। এই দুটি বৃত্তিকে আয়ত্তে রাখাই হচ্ছে সভ্যতার প্রধান অবদান। এই জন্যই এই ধরনের মানসিক ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছানুসারে হয় না, আমাদের অজ্ঞাতেই ঘটে। এই অবদমনের কাজ নানা কারণে সব মানুষের ক্ষেত্রে সবসময়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে না। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে চার রকমভাবে এই উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়—

১. বিবেকের দংশন, পাপবোধ, অন্যায়-অপরাধজনিত উৎকণ্ঠা।

২. শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি, অঙ্গহানি— এই সব নিয়ে উৎকণ্ঠা।

৩. প্রিয়জন বিচ্ছেদের আশঙ্কার ফলে উৎকণ্ঠা।

৪. নিজের সংযম হারিয়ে ফেলার জন্য যে উৎকণ্ঠা।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে বিবেকের দংশন, পাপবোধ, অন্যায় অপরাধজনিত উৎকণ্ঠা এবং নিজের সংযম হারিয়ে ফেলার জন্য যে উৎকণ্ঠা তারই প্রতিফলন দেখা যায়। অ্যাংজাইটি নিউরোসিসেরও প্রকাশ ঘটে। যেমন, 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসের দাশরথির বিবেকের দংশনের ফলে সৃষ্টি হয় উৎকণ্ঠা, 'সম্পর্ক' উপন্যাসে রামতনুর, 'সোনালী জীবন' উপন্যাসের সারার পাপবোধ, 'একা' উপন্যাসের শিশিরের মনে হয়েছিল সে তার স্ত্রীর প্রতি অন্যায়-

অপরাধ করেছিল। এই ধরনের মানসিক ক্রিয়া ইচ্ছানুসারে হয় না, অজ্ঞাতেই ঘটে যায়। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্ররা এই উৎকণ্ঠাকে কখনোই অবদমন বা রিপ্রেসন করতে পারেনি। তাই তো সারাকে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে হয়। 'ঘরবাড়ি' উপন্যাসের জয়াকে ছাদ থেকে লাফাতে হয়, 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসে ধীমান স্ত্রীকে হারানোর পর এক ধরনের অপরাধবোধ থেকে শ্রীলাকে গলা টিপে হত্যা করেছিল এবং শেষে নিজেও আত্মহত্যা করে। 'অচেনা আবেগ' উপন্যাসে জয়দীপ বরের বেশে আত্মহত্যা করেছিল। আত্মহত্যা করে সে প্রেমিকা শমিতাকে বোঝাতে চেয়েছিল তার ভালোবাসায় কোনো খাদ ছিল না।

'সোনালী জীবন' উপন্যাসে বড়বাবুর কাছে বলাৎকার হয় সারা। এরপর লেখক বিভিন্ন প্রতীকী ইঙ্গিতে সারার মনকে বুঝিয়েছেন। 'উনুনের গনগনে আঁচে ঝলসানো শিক কাবারের গন্ধে ভারী হয়ে ওঠা হাওয়ায় নিঃশ্বাস' নিতে হয় সারাকে। ''অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত ভৌতিক চাঁদের আলোয় কফিনের ভিতর শুয়ে থাকা মানুষের মুখের মতো দেখাচ্ছিল ওর মুখ।''[২৫] ট্রামের ঘণ্টা, রিক্সার ঠুন ঠুন শব্দ তার মনকে বিষিয়ে তুলেছিল। বাড়ি ফিরে আবার স্বামীর রগচটা মেজাজে আর অপমানে নিজেকে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল সারা। নারীমনের এমন অসহায়তার চিত্র দিব্যেন্দু পালিত আর অন্য কোনো উপন্যাসে তুলে ধরেননি। এই উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটাতে লেখক উপন্যাসের শিরোনামও দিয়েছেন 'স্মৃতির দিকে', 'আর্থারের স্বপ্ন দেখা', 'ভালোবাসায় প্রত্যাবর্তন', 'অন্ধকার বারান্দা', 'এ কেমন ভালোবাসা' ইত্যাদি। নারীপ্রধান এই উপন্যাসে নারীর অবচেতন মনকে জোর দিতে একাকীত্ব-নিঃসঙ্গতার মোটিফ এনেছেন লেখক, ''সম্ভবত প্রত্যেক মানুষেরই মনের ভিতর একটা জায়গা থাকে— সেখানেই তৈরী হয়ে যায় তার নিজস্ব ঘরবাড়ি কিংবা ধ্বংসের আকৃতি।''[২৬] শেষ পর্যন্ত সারাকে আত্মহত্যা করতে হয়।

'অনুভব' উপন্যাসে ইতিহাসবোধ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের অবিরাম আনাগোনা চলতে থাকে। চলতে থাকে আত্রেয়ীর আত্মবিশ্লেষণ। এড্ওয়ার্ড দুজারদিন কথিত 'ইন্টারনাল মনোলোগে'র প্রকাশও ঘটে। রাহুলের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার পর কলকাতায় ফিরে একমুখী নানা চিন্তা আত্রেয়ীকে ঘিরে ধরে। নিজেকে নিয়ে ভাবনার টানাপোড়েনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। সন্দেহ, হতাশা ও অনিশ্চয়তা থেকে এক ধরনের বিষণ্ণতা এসেছে।

"তখন মনে হয় একান্তে নিজেকে নিয়ে থাকাই ভালো। এক একদিন এমনও হয় যখন ঝলমলে দিনদুপুরেও ঝপ করে নেমে আসে অন্ধকার। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ঝাপসা লাগে চারদিক, জলজ গন্ধে ভারী হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস।"[২৭]

যতোদিন গেছে ততোই সে একা হয়ে পড়েছে। যতোই সে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করুক, হতাশা তার পিছু ছাড়েনি। হতাশা ক্রমশ বাড়তে থাকে। হঠাৎ ইচ্ছা থেকে পুরনো অ্যালবামের ছবি দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। নিজের মনে প্রশ্ন ওঠে, সে নিজেই সবার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এর জবাব খুঁজতে গিয়ে নিজেই দ্বিধাবোধ করে। রাহুলের অপমান তাকে আত্মমুখী করে তুলেছিল। 'এই যে দেড় বছর নিজের মন ও শরীরটাকে গচ্ছিত রেখেছিল রাহুলের কাছে, সম্পর্কটা স্বাভাবিক ভেবেই যথেচ্ছ হতে দিয়েছিল তাকে, এই ব্যাপারগুলো কি তাহলে যেমন ছিল তেমনই রেখেছে!"[২৮] অপমানের এই দিকটা সে কোনোদিনই ভুলতে পারেনি। স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে চলে এসেছিল কলকাতায়। সে এখন মুক্ত। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। বাঁচতে চায় নিজের মতো করে। স্বাবলম্বী হতে চাকরির দরখাস্ত করে। স্বনির্ভরতার এই জোরটাই তাকে টিকিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু দাদার বন্ধু উৎপলের সঙ্গে মেলামেশা করার সময়ও সে নিজেকে আড়াল করে রেখেছিল। অথচ উৎপলই তার শুভাকাঙ্ক্ষী। আসলে 'সে দাঁড়িয়ে আছে এক অন্ধকার সমুদ্রের সামনে, যেখানে শুধুই ঢেউ আর ঢেউ আর ঢেউ ছাড়া কিছুই নেই, চারপাশের শব্দ ও নৈঃশব্দ্য মিলতে পারছে না নির্দিষ্ট কোনও বিন্দুতে।"[২৯] রক্তের সম্পর্কেও আড়ষ্টতা ঢুকে পড়েছে। অতীত স্মৃতি থেকে মুক্তি নেই তার। কোনোদিকে এগোবার বদলে ক্রমশ গুটিয়ে যাচ্ছে নিজেরই ভিতরে। নিজের তৈরী রক্তের মধ্যে একা হতে থাকে সে। আত্রেয়ীর বিষণ্ণ মনকে বোঝাতে লেখক বৃষ্টি, নৈশব্দ, মেঘ, অন্ধকার ইত্যাদির প্রতীক বা প্রসঙ্গও এনেছেন। আসলে 'অনুভব' একটি নারীর অন্তর্বেদনার উপাখ্যান।

দুই পূর্ণবয়স্ক নারীপুরুষের জটিল মনোদৈহিক সম্পর্ককে 'মাত্র কয়েকদিন' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন লেখক। স্বামী মারা যাবার পর অদিতি একা হয়ে যায়। ছেলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিয়ে করে আলাদা হয়ে যায়। সেই একাকীত্ব আরো বেড়ে যায়। বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে অদিতি। একাকীত্ব কাটাতে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে স্বামী বন্ধু প্রিয়ব্রতর শরণাপন্ন হয়। আকর্ষণ বাড়তে থাকে। একসময় দেহমনের আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটে। কামের তাড়নায়

(লিবিডো) ছুটে যায় প্রিয়ব্রতর ফ্ল্যাটে। শরীরের সমস্ত কিছু উজাড় করে দেয়। প্রিয়ব্রতও ফিরিয়ে দেয়নি।

> "বাহান্ন বছর বয়সেও তার শরীর, স্বাস্থ্য, নিজেকে উজ্জীবিত করার ক্ষমতা এতটুকু টাল খায়নি। নিজের সমগ্র পৌরুষ নিয়ে সেদিন রাত্রে সে যখন অদিতির শরীরে প্রবেশ করে এবং আবেগ থেকে সম্পূর্ণ শরীরী হয়ে উঠে তার কাঁধে দাঁতের দাগ বসাতে বসাতে অস্ফুট অভিমানে কিছু বলতে থাকে অদিতি, তখনও, সেই কথাগুলো না শুনে নিজেকে পরিতৃপ্ত করার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে। যেন অদিতি নয়, তার সামনে সম্ভোগের জন্যে পড়ে আছে মাংসময় এক টগবগে নারী শরীর, যে কোনও নাম হতে পারে তার— বস্তুত কিছুই এসে যায় না নাম বা পরিচয়ে।"[৩০]

অল্প বয়সে বিধবা অদিতি আর বিবাহ না করা প্রিয়ব্রতর মধ্যে কামনা-বাসনার অবদমিত ইচ্ছা এতদিনে পূর্ণ হয়। কিন্তু পরের দিন সকালে অদিতির মনের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আসে। অদিতি সবকিছু উজাড় করে দিতে চেয়েছিল, দিয়েওছে। কিন্তু এইটুকু হওয়ার জন্য সে আসেনি। মানসিকভাবে ভেঙে পড়া অদিতি চেয়েছিল একটা আশ্রয়, একটা অবলম্বন। যা প্রিয়ব্রত দিতে পারেনি। তাই রাতের অন্ধকারে যে সুখ অনুভব করে ভোরের আলোয় তা ভেঙে যায়।

শুধুমাত্র পারস্পরিক আকর্ষণেই দুই পূর্ণ বয়স্ক নরনারীর অবৈধ সম্পর্কের গোপন রহস্য উন্মোচন করেছেন লেখক 'হঠাৎ একদিন' উপন্যাসে। বহুগামিতা এবং বিবাহোত্তর অবৈধ সম্পর্কের পর নারীপুরুষের জটিল মানসিকতার সৃষ্টি হয়। নায়গ্রা জলপ্রপাতের অতি সুন্দর পটভূমিতে আকস্মিক দেখা হয় শ্রীজিৎ ও অনুজার। সেই পরিচয় তাদের এমনি এক শারীরিক আকর্ষণের বন্ধনে জড়িয়ে ফেলে কলকাতায় এসেও চলতে থাকে তাদের উদ্দাম লুকোচুরি খেলা। তাদের আকর্ষণে কোনো আবেগ বা ভালোবাসা নেই, সবটাই শরীরের আকর্ষণ। এই আদিম প্রবৃত্তি বা লিবিডোর তাড়নায় দুজনের মধ্যে দেখা দিয়েছে এক ধরনের পাপবোধ। অনুজা তার স্বামী, সন্তানদের ঠকাতে চায়নি। তাদের ছেড়ে আসতেও পারেনি। এতো কিছু হবার পরও আনন্দই তাকে বেশি ভালোবাসে। তাই উপন্যাসের শেষে অনুজা নিজের অনুতাপ, অনুশোচনায় আনন্দর বুকে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে—

"সমস্তই শুধু একজনের সঙ্গে শরীর খেলার জন্যে— যে-খেলার অতীত ছিল না কোনও, যে-খেলার ভবিষ্যৎও নেই। শুধু নিজের জন্যে নয়, আনন্দকে প্রতারণা করার জন্যে তখন কীভাবে সারা শরীর ভেঙে কান্না জমা হয়েছিল চোখে! আর, তখনই মনে হয়েছিল, এই বৃষ্টি, এই অভিজ্ঞতা হয়তো কোনও সংকেত পাঠাচ্ছে তার কাছে— ইঙ্গিত দিচ্ছে নিষেধের, যা হয়েছে হয়ে গেছে, এবার ফেরো। অর্থহীনতার পিছনে এইভাবে ছুটে কোন সর্বনাশ ডেকে আনছ তুমি!"[৩১]

ফটোগ্রাফার শ্রীজিৎও তার স্ত্রী বিপাশাকে থকাতে পারেনি। অসুস্থ বিপাশার যৌন ক্ষমতা হারিয়ে গেছে। ফলে তেইশ-চব্বিশ বছরের দাম্পত্যজীবনে সুখ পায়নি শ্রীজিৎ। সিনেমা সাংবাদিক আনন্দকমলের স্ত্রী অনুজার প্রতি তার আকর্ষণ ভালোবাসায় নয়, শরীরী হয়ে উঠে। সেই শারীরিক আকর্ষণে তৃপ্তি অনুভব করলেও অসুস্থ স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায়। এর ফলে তার অবচেতন মনে এক ধরনের হীনম্মন্যতার সৃষ্টি হয়। শ্রীজিতের মধ্যে একটা লাগামছাড়া জীবন ছিল বটে। কিন্তু সেই লাগামছাড়া জীবনে অনুজা আর সঙ্গ দিতে পারেনি। আনন্দকে প্রতারণা করার জন্য তার সারা শরীর ভেঙে কান্না জমা হয়েছিল চোখে। অপরদিকে শ্রীজিতের মানসিকতার তীব্র পরিবর্তন ঘটিয়েছেন লেখক। শ্রীজিতের বন্ধু শুভঙ্কর সেরিব্রাল অ্যাটাকে হাসপাতালে ভর্তি হলে বাস্তবের মাটিতে নেমে আসে শ্রীজিৎ। অসুস্থতার পরিবেশে বিপাশার কথা চিন্তা করতে করতে শ্রীজিতের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে।

ইয়ুং মনে করেন, ব্যক্তির অতীত জীবনে বা শৈশবে নয় বর্তমানেই নিউরোসিসের কারণ নিহিত। আর শুধু বাসনার অতৃপ্তিই রোগের কারণ নয়। জীবনসংগ্রামে পরাজয়ই তার কারণ। ব্যক্তি সর্বদাই বাস্তবের সম্মুখীন হওয়ার চেষ্টা করছে। বাস্তবের বিভিন্ন সমস্যা তাকে সমাধান করতে হচ্ছে। কিন্তু কোনো সমস্যার সমাধান যদি তার সামর্থ্যে না কুলোয় তখন তার লিবিডো বাস্তব থেকে সরে ব্যক্তির শৈশবাবস্থায় প্রত্যাবৃত্তি করে। ফলে ব্যক্তি বাস্তবের সম্মুখে এলোমেলো নানা আচরণ করতে থাকে। এমনি অবস্থায় নিউরোসিস দেখা দেয়। ইয়ুং বলেছেন—

"Therefore I no longer final the cause of a neorosis in the past, but in the present. I ask, what is the necessary task which the patient will not accomplish?"[৩২]

বাস্তবের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীনই দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে নিউরোসিস বা উদ্বায়ু রোগে ভুগিয়েছে। রামতনু, দাশরথি, অনীশ, রজত, আদিত্য, এষা, তপতী, শিশির, প্রিয়ব্রত, আত্রেয়ী প্রমুখ চরিত্রের সমস্যা বর্তমানের জীবনসংগ্রামের সমস্যা। অতীতের কোনো সমস্যা নয়। কামনা-বাসনার অতৃপ্তিও তাদের মধ্যে বড়ো নয়। আবার ইয়ুং এও বলেন, বাস্তব সমস্যাই নিউরোসিসের একমাত্র কারণ নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণেও এ রোগ হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যৌন ইচ্ছার বিশৃঙ্খলার দরুনও হতে পারে। চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যেও যে নিউরোসিস দেখা দেয়, তাদের কারণ হিসাবে তিনি বলেন, বাস্তব সমস্যা, অতৃপ্ত যৌন ইচ্ছা বা অস্বাভাবিক ক্ষমতাস্পৃহা বর্তমান থাকে। চল্লিশের পর তা আর থাকে না। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তিরও যৌন আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে। 'হঠাৎ একদিন' উপন্যাসের শ্রীজিতের বয়স একান্ন-বাহান্ন। এই বয়সেও সে বিবাহিত নারী অনুজার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। 'মাত্র কয়েকদিন' উপন্যাসে বাহান্ন বছর বয়সী প্রিয়ব্রতও কামের তাড়নায় স্থির থাকতে পারেনি। বারবার বন্ধুর স্ত্রী অদিতির কথা মনে পড়েছে। একবার দেহ মিলন হবার পরও চলতে থাকে তাদের গোপন মেলামেশা। আসলে আমাদের মধ্যে যে অনুভূতি রয়েছে তা অতিক্রম করে পূর্ণতালাভের প্রয়োজন হয়ে ওঠে। ইয়ুং এর মতে—

"The symtoms of neurosis are not simply the effects of long past causes, whether infantile sexuality or the infantile urge to power, they are also attempts at a new synthesis of life— unsuccessful attempts let it be added— yet attempts nevertheless, with a core of value and meaning."[৩৩]

স্বপ্নের মধ্যে গোপনীয়তার স্থান— ফ্রয়েডের এই মতকে ইয়ুং মেনে নেননি। স্বপ্নে ফ্রয়েড যে নির্জ্ঞান ও সংজ্ঞানের দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন, ইয়ুং সে দ্বন্দ্বও অস্বীকার করেছেন। তাঁর

মতে, স্বপ্নে নির্জ্ঞান যেন সংজ্ঞানের সহায়তা করে। নীতিবিরোধী ইচ্ছার প্রকাশই যে স্বপ্নের বিষয়বস্তু একথাও অস্বীকার করেন। সেই কারণেই শুধু অতীতকে আশ্রয় করেই স্বপ্ন রচিত হয় তাও মেনে নেননি। তিনি বলেন, অতীতকে নিয়ে স্বপ্ন নয়, স্বপ্নের লক্ষ্য বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। জীবনে নব নব সমস্যার সমাধান চাই। জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত মানুষ বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্মুখীন হওয়ার জন্যে সংজ্ঞানে নানা চিন্তা করে। নির্জ্ঞান সংজ্ঞানের পরিপূরক হিসেবে ঐ বিষয়ে সাধ্যমতো থাকবে। তাই স্বপ্নের মধ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্যা-সমাধানমূলক নানা ইঙ্গিত দেখা দেয়। ইয়ুং বলেছেন—

> "The activity of the consciousness, speaking logically represents the psychological effort which the individual makes in adapting himself to the conditions of life. His consciousness endeavours to adjust itself to the necessities of to moment, or, to put it differently: there are the tasks ahead of the individual, which he must overcome. Now we have no reasons for assuming that the unconscious follows other laws than those which apply to conscious thought. The unconscious, like the conscious, gathers itself about the biological problems and endearous to find solutions for these by analogy with what has gone before, just as much as the conscious does."[৩৪]

স্বপ্নে প্রাপ্ত নির্জ্ঞানের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যক্তিত্বকে চালনা করলে জীবনে শুভ ফল পাওয়া যায়। অনেক সময় স্বপ্নে আসন্ন বিপদের কথাও জানতে পারা যায়। স্বপ্নে উচ্চারিত এই সতর্কবাণীকে গ্রহণ করলে অবশ্যম্ভাবী সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণও পাওয়া যায়। তবে জীবনের সমস্যামূলক নির্দেশই স্বপ্নের একমাত্র বিষয়বস্তু নয়। অবদমিত ইচ্ছাও স্বপ্নে দেখা দিতে পারে—

> "It is certainly true that there are dreams which embody suppressed wishes and fears, but what is there which the dreams can not on occasion embody ? Dreams may give expression to ineluctable truths, to philosophical pronouncement, illusions, wild fantasies, memories,

plans, anticipations, irrataional experiences, even telepathic vissions and heaven knows what besides."[৩৫]

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে শিশু মনস্তত্ত্বও উঠে এসেছে। তাদের মনস্তত্ত্ব দেখা দিয়েছে যখন বাবা-মার দাম্পত্যজীবনে বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে। বাবা-মার বিচ্ছেদের কথা ভেবে তাদের মনে দেখা দিয়েছে বিষণ্ণতা। 'সেকেন্ড হনিমুন', 'যখন বৃষ্টি', 'বহুদূর অভিমান' উপন্যাসে এই শিশু মনস্তত্ত্ব আলোচনা করা যেতে পারে। 'সেকেণ্ড হনিমুন' উপন্যাসে শিলাজিৎ আর শ্রেয়ার বিচ্ছেদ যখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, তখন তাদের ছেলে পূষন হোস্টেল থেকে বাড়ি ফিরে আসে। শিলাজিৎ রাত্রে সুপর্ণাকে চরম অপমান আর নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করলে পূষণ স্থির থাকতে পারেনি। তার মাথায় রক্তচাপ বাড়ে। মিনের কাজ করা দুটো ফুলদানির একটা আছড়ে ভাঙে। সুপর্ণা ঘরে ঢুকে বুঝতে পারে পূষন কী বলতে চায়? তার চোখের দৃষ্টি দেখে সুপর্ণা বুঝতে পারে পূষণ কি ভাবছে? তারপর পূষনের আর ঘুম হয়নি। এক অস্থির সময়ের সম্মুখীন হয় সে। বাবা-মার সম্পর্কের অবনতি তার শিশু মনে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে।

'যখন বৃষ্টি' উপন্যাসে পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ে রিয়াও হোস্টেলে থাকে। বাবা-মার বিচ্ছেদের কথা সে জানে না। তাকে না বলেই তার বাবা-মা আলাদা জায়গায় বাস করতে থাকে। কেবল নিয়ম করে সপ্তাহে এক দুই দিন তাকে দেখতে যায়। হোস্টেলে যখন রিয়া একা অনুভব করে তখন বাড়িতে ফোন করে বাবা-মা কাউকে পায়নি। রাত্রে আবার বাবাকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে। রিয়া খুব সেনসিটিভ মেয়ে। সারারাত ঘুমোয়নি তারপর। কাউকে কিছু বলতেও পারেনি। একাকীত্ব অনুভব করে রিয়া। পরের দিন সকালে ফ্ল্যাটে গিয়েও বাবা-মা কাউকে পায়নি। মামার বাড়ি গিয়ে কাঁদতে থাকে। রিয়া পাগলের মতো হয়ে যায়। রাত্রে বাবাকে নিয়ে দেখা দুঃস্বপ্ন আর পরের দিন ফ্ল্যাটে গিয়ে বাবা-মা কাউকে দেখতে না পারা রিয়ার মনে একটাই উক্তি 'বাবাকে খুঁজে দাও'। দুদিন পর বাবাকে যখন ফোনে পায় তখন রিয়া তার বাবাকে বলেছে—

"দু'রাত ঘুমোয়নি, আজ আমি ঘুমোতে যাব। তোমাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না—তোমাকে খুঁজছিলাম, আজ তোমার খোঁজ না পেলে কী করতাম জানি না।"[৩৬]

'বহুদূর অভিমান' উপন্যাসে ব্রতীন আর অনিশার একমাত্র ছেলে রাজদীপ। স্কুলের পরীক্ষায় ফেল করলে প্রিন্সিপাল তাকে ট্রান্সফার নিতে বাধ্য করেন। কোনো উপায় না পেয়ে তার বাবা-মাও তাকে কলকাতা থেকে দূরে এক স্কুলে ভর্তি করে দেয়। রাজু হোস্টেলে থাকে। কিছুদিন পর ব্রতীন আর অনিশার দাম্পত্যজীবনে বিচ্ছেদ আসে। বাবা-মার বিচ্ছেদের পাশাপাশি কিশোর রাজুও বিচ্ছিন্ন হতে থাকে তাদের থেকে। রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে রাজু মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে থাকে। রাজু যখন বাড়িতে থাকতো তখনই তার বাবা-মার সম্পর্কটা যে ভালো নয় সেটা বুঝতে পারে। বাবা-মার ঝগড়ার সময় একদিন রিঅ্যাক্টও করেছিল—

> "একবার তো স্বামী-স্ত্রীর কথা কাটাকাটি উত্তাল হয়ে উঠতে ফল কাটার ছুরি হাতে নিয়ে ওদের বেডরুমে ঢুকে পড়েছিল : 'ঝগড়া থামবে, না খুন করব!"[৩৭]

বাস্তবিক, সেদিন ঐ চিৎকারের পর তার বাবা-মা তার সামনে আর কোনোদিন ঝগড়া করেনি।

রাজু জানে তার বাবা-মার সম্পর্কটা ভালো নয়, ডিভোর্স হয়ে গেছে। সেপারেশন পর্ব থেকেই বাবা-মা'র স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, এটা আস্তে আস্তে বুঝিয়েছিল ব্রতীন আর অনিশা। কিন্তু রাজু জেদি, একগুঁয়ে ও রাগী হয়ে ওঠে। তাকে ভালোবাসার আশ্বাসের কথা বললেও রাজু হঠাৎই বলে ওঠে—

> "অত বক্তৃতা দেওয়ার কী আছে! বাপ-মা তো অনেকেরই মরে যায়, তারা কি বাঁচে না! কেউ বাজারে কুলিগিরি করে, কেউ পকেট মারে, কেউ—। আমি পরোয়া করি না।"[৩৮]

শুধু কথাবার্তার ধরনই পাল্টায়নি, চেহারতেও বদলে গিয়েছে রাজু। ব্রতীন স্পষ্ট বুঝতে পারে, "তার বা তাদের অনেক আগেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ও— এখানে ক্ষোভ ও অসহিষ্ণুতার একটা প্রকাশ ঘটল। বোঝা যায় তাদের আর সহ্য করতে পারছে না; বাইরে রাগ দেখালেও আড়ালে কাঁদছে কি না কে বলবে! বয়সটা খারাপ, এই বয়সে এমন মানসিকতা থেকে অনেকেই আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে"।[৩৯]

আসলে বা-মার ঝগড়া আর অশান্তিতে রাজুর মেজাজ রুক্ষ হয়ে গেছে। বাবা-মার ছাড়াছাড়ি দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে তার মনটাকে। রাজু আরো ক্ষুব্ধ ও জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে যখন তাঁর মা দ্বিতীয় বিয়ে করবে বলে সে শুনেছে। একমাত্র সঙ্গী পরমহংসকে বলেছে, "মা না-থাকায় তোর কষ্ট; আর যাদের মা থেকেও নেই, তাদের কষ্টটা কেমন হয় বুঝতে পারিস? তখন রাগ হয়, গা জ্বালা করে— মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে নিজেকে— "[৪০]

রাজু মানসিক সুস্থিতি হারিয়ে ফেলে। ক্রমশ খারাপের দিকে এগোতে থাকে। সায়ন, চন্দ্রদের সঙ্গে মারপিট করে, নেশাগ্রস্থও হয়ে পড়ে একসময়। বাবা-মার সম্পর্কের দূরত্ব কতোখানি প্রভাব করে কিশোর রাজুর মনে তাই লেখক এখানে দেখিয়েছেন।

দিব্যেন্দু পালিত কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব মাথায় রেখে সৃজনশীলতার পথে অগ্রসর হননি। হয়তো কিছু তাত্ত্বিক ভাবনা তাঁর মগ্ন চেতনায় ছিল, যা লেখনীর মাধ্যমে ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছায়। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে গ্রাম্যজীবন বিচ্ছিন্ন নাগরিক মধ্যবিত্ত তার একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গের মধ্যে এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক সংকট লালন করেছে। জগৎ ও জীবনের বিচিত্রমুখী জটিলতা, নৈরাশ্য, মোহভঙ্গ, বিভ্রান্ত প্রভৃতি সার্থক রূপ পায় তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রগুলোর অবদমিত হৃদয়ের বহুমুখী বিকার ও বিক্ষোভ প্রথম থেকেই ধরা পড়েছে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রের মনোজগতের বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আপসপ্রবণতা, পলায়নপ্রবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ও ধরা পড়েছে। যেমন 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসে ধীমান। আসলে মধ্যবিত্তের রক্ষণশীলতা ও সীমাবদ্ধতায় অবদমিত মানুষের বিকার তার উপন্যাসে আসে। 'সহযোদ্ধা'য় আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে মানসিক সম্পর্কের দ্বন্দ্ব আদিত্যকে মানসিক শূন্যতায় নিক্ষেপ করেছে। দিব্যেন্দু পালিত মূলত নারী-পুরুষের মনোদৈহিক জটিলতার স্বরূপ স্পর্শ করেছেন। দেহ-মনের সন্তুষ্টি যেমন জীবনকে সুখে সংপ্লাবিত করে, তেমনি এর অতৃপ্তি এবং অসন্তুষ্টি মনোবিকার ও বিক্ষোভের জন্ম দেয়।

তথ্যসূত্র :

১. পালিত, দিব্যেন্দু : সিন্ধু বারোয়াঁ, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৯৭

২. তদেব : পৃ. ৬৮

৩. তদেব : পৃ. ৬৯

৪. পালিত, দিব্যেন্দু : সেদিন চৈত্রমাস, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ১৩৩

৫. তদেব : পৃ. ৯৭

৬. নন্দী, ধীরেন্দ্রনাথ : মনের বিকার ও প্রতিকার, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ২৯

৭. পালিত, দিব্যেন্দু : প্রণয়চিহ্ন, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৯০

৮. তদেব : পৃ. ৪২৩

৯. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছুস্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ১০৮

১০. পালিত, দিব্যেন্দু : সন্ধিক্ষণ, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১৩০

১১. Jung, C. G. : Modern Man in Search of a Soul, Translated by W. S. Dell and Cary F. baynes, printed by great britian by Lund Humphrise, London, Bradford, Reprinted-1961, p. 217

১২. পালিত, দিব্যেন্দু : সন্ধিক্ষণ, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ২৫

১৩. তদেব : পৃ. ২৮

১৪. পালিত, দিব্যেন্দু : সম্পর্ক, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৭০

১৫. পালিত, দিব্যেন্দু : আমরা, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১৮২

১৬. পালিত, দিব্যেন্দু : একা, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৪৩০

১৭. তদেব : পৃ. ৪৫১

১৮. তদেব : পৃ. ৪১২

১৯. পালিত, দিব্যেন্দু : উড়োচিঠি, দশটি উপন্যাস - ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৫১৫

২০. তদেব : পৃ. ৫১০

২১. পালিত, দিব্যেন্দু : অবৈধ, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৫৮২

২২. তদেব : পৃ. ৫৮৩

২৩. Benvenuto, Bice; Kennedy, Roger : The Works of Jacques Lacan, an introduction, FAB, 1986, p. 74

২৪. নন্দী, ধীরেন্দ্রনাথ : মনের বিকার ও প্রতিকার, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ২১

২৫. পালিত, দিব্যেন্দু : সোনালী জীবন, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ২৩০

২৬. তদেব : পৃ. ৫৮৩

২৭. পালিত, দিব্যেন্দু : অনুভব, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৪, পৃ. ১০

২৮. তদেব : পৃ. ১৫

২৯. তদেব : পৃ. ৩৭

৩০. পালিত, দিব্যেন্দু : মাত্র কয়েকদিন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৩৮

৩১. পালিত, দিব্যেন্দু : হঠাৎ একদিন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১০, পৃ. ৮২

৩২. Jung, C. G. : Collected Papers on Analytical Psychology, edited by Dr. Constance E. Long, Moffat Yard and Company, New York, Second Edition – 1917, p. 232

৩৩. Jung, C. G. : Two Essays on Analytical Psychology, translated from the German by R. F. C. Hull, New York, Second Edition - 1966, p. 45

৩৪. Jung, C. G. : Collected Papers on Analytical Psychology, edited by Dr. Constance E. Long, Moffat Yard and Company, New York, Second Edition – 1917, p. 222-223

৩৫. Jung, C. G. : Modern Man in Search of a Soul, Translated by W. S. Dell and Cary F. baynes, printed by great britian by Lund Humphrise, London, Bradford, Reprinted-1961, p. 13

৩৬. পালিত, দিব্যেন্দু : যখন বৃষ্টি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২, পৃ. ৭৭

৩৭. পালিত, দিব্যেন্দু : বহুদূর অভিমান, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট, লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২৫

৩৮. তদেব : পৃ. ২৫

৩৯. তদেব : পৃ. ৩৭

৪০. তদেব : পৃ. ৪৫